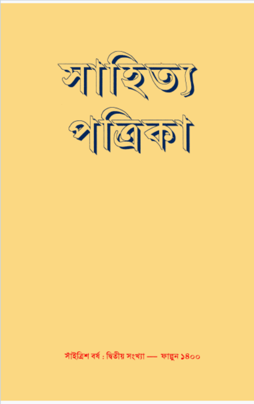

Vol. 37 | No. 2 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব এবং বাংলার দেশজ নাট্যের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস

Volume	37
Issue	2
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ জামিল আহমেদ
Published online	February 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i2.5
Pages	129-150
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ২

Check for updates

নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব এবং বাংলার দেশজ নাট্যের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস

সৈয়দ জামিল আহ্‌মেদ

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বাংলাদেশের নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি উনবিংশ শতকের পূর্বে অপ্রচলিত ছিল। পুরুষ ও নারী চরিত্রের কুশীলবদের স্ত্রী-পুরুষ বিচার সম্পর্কে ইউজেনিও বারবার নতুন তত্ত্বের পরে এই বিষয়ে অনুসন্ধান বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বারবার মতে, পৌরুষ ও নারীত্ব যথাক্রমে পুরুষ ও নারী দ্বারাই যে সর্বোত্তমভাবে রূপায়িত হবে, এটি স্বতসিদ্ধ নয়। মুনক অবশ্য এই তত্ত্বের বিরোধীতা করেন। বাংলার দেশজ নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাস পর্যালোচনা করে, বারবা-মুনক বিতর্কের আলোকে, এই অঞ্চলের নাট্যে কুশীলবদের উপস্থিতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

নিবন্ধের জরীপ ও যুক্তির আলোকে বলা যায় যে বাংলায় নারী কুশীলব সকল যুগেই অভিনয় করেছে; কখনও সংস্কৃতির মূল ধারায়, কখনও বা প্রান্তিক ধারায়। ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যে কুশীলবের লিঙ্গ এবং চরিত্রের লিঙ্গ-এই দুইয়ে বিভেদ স্বীকৃত হয় নি।

সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

ক্লাসিকীয় গ্রীক যুগের ট্র্যাজেডি, কমেডি ও সাতির এবং এলিজাবেথীয় যুগের কোনো নাট্য প্রযোজনায় নারী কুশীলব (Performer) এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না যদিও উল্লেখিত যুগের নাটক বিশ্বনন্দিত। জানামতে পাশ্চাত্যের নাট্যে নারী কুশীলবের সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটে রোমান যুগের '*মাইম*' নামক (আধুনিক মুকাভিনয় নয়) নাট্যরীতির মাধ্যমে। দু'একটি ভিন্ন প্রয়াসের কথা বাদ দিলে ইংল্যান্ডের নাট্যমঞ্চে নারী কুশীলবের সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটে কমনওয়েলথ যুগে[১] অভিনীত একটি অপেরায়, যদিও এর বহু পূর্বে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মঞ্চে নারী কুশীলবের আর্বিভাব ঘটেছিল।

এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় কাহিনী অধিকতর তথ্যবহুল। ধারণা করা হয় যে জাপানের জনপ্রিয় নাট্যরীতি *কাবুকি*-এর উদ্ভব ঘটে আনুমানিক ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে কিওতো নগরীর ওকুনি নাম্নী এক নটিনীর[২] সর্বসাধারণ-সমক্ষে নৃত্যাভিনয় হতে। ওকুনির নৃত্যাভিনয় অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে শোগুন মঞ্চে নারী কুশীলবের অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার কারণ হিসেবে জনগণের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতি ইংগিত ব্যক্ত করা হয়।

প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে চীন দেশে। আদিতে নারী কুশীলব কর্তৃক স্ত্রী চরিত্র অভিনীত হলেও অষ্টাদশ শতকের শেষে নারী কুশীলবের জন্য মঞ্চ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই ক্ষেত্রে অবশ্য জনগণের মূল্যবোধ-অবক্ষয় সংক্রান্ত আশঙ্কা ছিলনা, ছিল খোদ অভিজাতবর্গের নারী কুশীলব সংক্রান্ত কলহ। অবশেষে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে নারী কুশীলব ফিরে আসেন চীনদেশের নাট্যমঞ্চে।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বাংলাদেশের নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি উনিবংশ শতকের পূর্বে অপ্রচলিত ছিল। যদি লেবেদেফ (*কাল্পনিক সংবদল*, ১৭৯৫) ও নবীনচন্দ্র বসু (*বিদ্যাসুন্দর*, ১৮৩৫) প্রযোজকদ্বয়ের বিচ্ছিন্ন চেষ্টাগুলোকে গণনায় না আনা হয় তবে ধরে নেয়া যায় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে অভিনীত *শর্মিষ্ঠা* নাটকে জগদতারিনী, গোলাপ, এলোকেশী এবং শ্যামা বাংলার নাট্যামঞ্চের ইতিহাসে লিপিবদ্ধকৃত প্রথম নারী কুশীলব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত যাত্রায় পুরুষ কুশীলব দ্বারা স্ত্রী চরিত্র অভিনয় ছিল প্রচলিত প্রথা।

উল্লেখিত তথ্য হতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, নারী কুশীলব দ্বারা স্ত্রী চরিত্র অভিনয় কি আদৌ অপরিহার্য? গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডি, শেক্সপীয়ারের সকল নাটক, *নো* ও *কাবুকি* নাটক, বেইজং অপেরা ইত্যাদি উল্লেখিত প্রশ্নের বিপক্ষে জবাব দেয়। ইউজেনিও বারবা একারণেই দাবী জানিয়েছেন যে চরিত্র চিত্রণ বিচারে কুশীলব পুরুষ কি নারী – সে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। তিনি এটাই দেখাতে চেয়েছেন, 'পৌরুষ' এবং

'নারীত্ব' যথাক্রমে পুরুষ এবং নারী দ্বারাই যে সর্বোত্তমভাবে রূপায়িত হবে এমনটা অত্যাবশ্যক নয়। "প্রাক-অভিব্যক্তি পর্যায়ে (অর্থাৎ শৈল্পিক অভিব্যক্তির পূর্বপর্যায়ে) কুশীলবের লিঙ্গ পরিচয় ন্যূন গুরুত্ববহ। *টিপিক্যাল* 'পৌরুষ' এবং 'নারীত্ব'- এর কোন অস্তিত্ব নেই।" বারবা ধারণা করেন, প্রতিটি মানুষে রয়েছে নমনীয় anima শক্তি এবং শৌর্যবান animus শক্তি। কুশীলব যখন এই শক্তির সাহায্যে নিজ 'উপস্থিতি' ('presence')-'কে দৃশ্যমান ও চরিত্রে রূপান্তরিত করেন তখনই পৌরুষ বা নারীত্বকে প্রত্যক্ষ করা যায় [Barba ১৯৯১ : ৭৯-৮১]। কিন্তু এর বিপক্ষেও যুক্তি রয়েছে। এরিকা মুনক মার্কসীয় ব্যাখ্যা অবতারণা করে বলেন, "পুরুষ যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আসীন তখন তারাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে 'নারীত্ব'-এর ধারণাটির জন্ম দেবে, আত্মশ্লাঘা বশে তারা 'রমণীয় শক্তি'-এর সুযোগ গ্রহণ করবে অথচ নারীদের জন্য তা থাকবে নিষিদ্ধ [Bharucha 1990 : ৭৩]। বাংলার দেশজ (ইউরোপীয় নয় এমন, অর্থাৎ সংস্কৃত এবং লোক) নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস পর্যালোচনা করে, বারবা-মুনক বিতর্কের আলোকে, এতদঞ্চলের দেশজ নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

দুই

বাংলার দেশজ নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি অনুসন্ধানের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে উদ্দিষ্ট সময়ে রচিত পাণ্ডুলিপিসমূহ। কিন্তু অ্যারিস্টটোলীয় ঐতিহ্যঘটিত ইউরো-মার্কিন নাট্যধারার অনুগামী হয়ে ভারত উপমহাদেশে লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহে নাট্য উপাদান অন্বেষণ বিফল হবে; কারণ এ অঞ্চলের নাট্যনির্মাণকৌশল সম্পূর্ন ভিন্ন। অতএব বাংলার দেশজ নাট্যের প্রেক্ষিতেই 'নাট্য' (Theatre) সংজ্ঞায়িত করা জরুরি যা অবশ্যই পূর্বোক্ত অ্যারিস্টোটোলীয় ঐতিহ্য অনুসৃত নয়। দ্বন্দ্ব, চরিত্র ভূমিকায় অভিনয় এবং উত্তম পুরুষে সংলাপ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইউরো-আমেরিকান "ড্রামা" গঠিত। বাংলার দেশজনাট্যের 'কথানাট্য' ও 'নাটগীত' ঐতিহ্য পূর্বতন উপাদানের সাথে বর্নর্ণাত্মক অভিনয়, দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি এবং 'রস' বিস্তার সন্নিবেশিত করেছে। এছাড়াও রয়েছে সংগীত ও নৃত্যের প্রাধান্য।[৩] এখানে একজন কুশীলব, নট বা নটী যাই হোন, কেবল অভিনেতা/নেত্রীই নন, একই সাথে একজন নাচিয়ে এবং/অথবা গাইয়েও।[৪] কেবল এই পটভূমিতেই আমরা দেশজ নাট্যে নারী কুশীলব-এর নিদর্শন খুঁজতে পারি। যেহেতু বাংলা বৃহত্তর ভারতীয় (উপমহাদেশীয়) সংস্কৃতির মূলস্রোতজাত, সেইহেতু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের অন্বেষণের

প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। প্রাচীন ভারতে প্রথম সহস্রাব্দে সংকলিত *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *কঠ উপনিষদ*, *ঐতিরেয় ব্রাহ্মণ*, *কামসূত্র* (বাৎসায়ন) এবং *মহাভাষ্য* (পতঞ্জলি) ইত্যাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে নারী কুশীলবের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যকৃত *অর্থশাস্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে :

> স্বামী দ্বারা প্রতিষিদ্ধা হইয়াও যদি স্ত্রী .... দিনের বেলায় স্ত্রীলোক দ্বারা প্রযুজ্যমান নাট্যাদি দর্শন বা (উদ্যানাতিতে) বিহার গমন করে, তাহা হইলে তাহার ৬ পণ দণ্ড হইবে। এবং স্ত্রীপুরুষ দ্বারা প্রযুজ্যমান প্রেক্ষায় (নাট্যাদি দর্শনে) ও বিহারে গমন করিলে পর, তাহার ১২ পণ দণ্ড হইবে। রাত্রিতে তাহার দ্বিগুন দণ্ড (অর্থাৎ স্ত্রীপ্রেক্ষা ও বিহার গমনে ১২ পণ ও পুরুষ প্রেক্ষা ও বিহার গমনে ২৪ পণ দণ্ড) হইবে। [কৌটিল্য ১৯৬৩ : ২৪২]।

কৌটিল্যের আলোচনা হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশে সম্পূর্ণরূপে নারী কুশীলব দ্বারা অভিনীত 'স্ত্রীপ্রেক্ষা' নামে এক প্রকার নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। অধুনাকালে এম. এল. ভারদপাণ্ডে এ বিষয়ে উল্লেখিত মত সমর্থন করেন [Bharat Pande ১৯৭৯ : ৩৫-৪১]

প্রাচীনকালে নারী কুশীলবদের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অপর কিছু আলোচনা থেকে। *অর্থশাস্ত্রে* তিনি উল্লেখ করেছেন :

> যে (আচার্য্য) গণিকা, দাসি ও রঙ্গোপজীবিনীদিগকে (নটাদির স্ত্রীদিগকে) গীত, বাদ্য, পাঠ্য (আখ্যায়িকাদির পাঠকৌশল), নৃত্য, নাট্য, অক্ষর (লিপিবিদ্যা), চিত্র, বীণা, বেণু (ইত্যাদি...) জ্ঞান শিক্ষা দিবেন, রাজমণ্ডল (অর্থাৎ নগর গ্রামাদি হইতে উত্থিত রাজকররূপ আয়) হইতে তাহার আজীব বা বৃত্তি ব্যবস্থা করিবেন [কৌটিল্য ১৯৬৩ : ১৯০-৯১]।

নারী কুশীলব সংক্রান্ত এসকল উল্লেখের সমর্থন মেলে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেবর্তী সময়ে সংকলিত নাট্যকলা সম্পর্কিত ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক গ্রন্থ *নাট্যশাস্ত্র* হতে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে ভরতের শত কুশীলব সম্বলিত নাট্যদলের জন্য প্রভু বিষ্ণু তাঁর মন থেকে নিপুণ অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করলেন, তাঁদের সংখ্যা হলো তেইশ। শৃঙ্গার রস, মনোরম বেশ ও কোমল অঙ্গহার সম্বলিত

কৈশিকী বৃত্তি "নারী ব্যতিরেকে পুরুষ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেনা" বলেই ব্রহ্মা অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করনে [ভরত ১৯৮০ : ৮]। সে যুগের নাট্যদলে থাকতেন 'নটী' (নর্তকী/অভিনেত্রী), যিনি নাট্যের সূত্রধরসহ সকল সংস্কৃত নাট্যের প্রস্তাবনা অংশে মূল ঘটনার অবতারণা করতেন এবং 'নটকীয়া' বা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। [Tarlekar, ১৯৭৫; ২০৮ - ২১০; Shekhar, ১৯৭৭ : ৮৭] কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষ এবং পুরুষ চরিত্রে নারী -এমন নিদর্শনও নাট্য শাস্ত্রে বিরল নয় :

> যখন কোন পুরুষ স্ত্রী চরিত্র ধারণ করে তখন তার অভিনয়কে বলা যায় অনুকরণমূলক ('রূপানুসারিণী')। প্রকৃতপক্ষে কোন নারী যদি চান তবে তিনিও পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। [ভরত ১৯৬৭ : ২১৭]

উপরন্তু নাট্যশাস্ত্রে এমন নির্দেশও রয়েছে যে দেব-দেবী এবং কমণীয় তনু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা সর্বদা নারী কুশীলব দ্বারা অভিনত হওয়া বাঞ্ছনীয় [ভরত ১৯৬৭ : ২১৮]। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরসমূহে, "পুরুষ ভূমিকা নারী কুশীলব দ্বারা অভিনীত হতো"; প্রথম ক্ষেত্রে হারেমে রক্ষিতা রমণী এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেবদাসীবৃন্দের উপস্থিতির কারণে। [ভরত ১৯৬৭ : ২১৮]

রাজসভা এবং সম্ভ্রান্তমহলের সাথে সম্পৃক্ত এসকল নারী কুশীলবদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে এইটুকু উল্লেখই যথেষ্ট যে বেদোত্তর যুগ হতে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ নীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে এঁরা ছিলেন চরমভাবে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রী। কৌটিল্যের মত দিকপাল *অর্থশাস্ত্রে* ঘোষণা দিয়েছেন যে "গান ও নাচ হলো শূদ্রদের পেশা" ; মনু "একজন অভিনেতার স্ত্রীকে নৈতিক শৈথিল্যের জন্য ভর্ৎসনা করেছেন এবং তাঁর ছাত্রদের সংগীত ও নৃত্যকলা অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন [Shekar ১৯৭৭ : ৮৭]।

তিন

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য ও চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে বাংলা খুব সরাসরিভাবে উত্তর ভারতীয় (আর্য) সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। উত্তর ভারতীয় নাট্যচর্চার ধারা যে অষ্টম শতকের বাংলাতেও প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায় *পৌণ্ড্রবর্ধনের* কার্তিকেয়ের মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্যগীতাভিনয়ের সাথে *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত বিভিন্ন বিধানের সাযুজ্য দেখে। এ সময়ে কলহন তাঁর *রাজতরঙ্গিনী* গ্রন্থে

কমলা নাম্নী পৌণ্ড্রবর্ধনের এক বিখ্যাত দেবদাসীর উল্লেখ করেছেন [নীহাররঞ্জন রায় ১৯৯৩ : ৩১০]। পাহাড়পুর (অষ্টম খ্রিষ্টাব্দের প্রথমাংশে) এবং ময়নামতি (অষ্টম খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধে) বৌদ্ধ মন্দিরের গাত্রদেশে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে চিত্রিত হয়েছে অসংখ্য নৃত্যরত পুরুষ ও নারী মূর্তি। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* এবং *ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে* নটকে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নশ্রেণীর শূদ্র হিসেবে [নীহাররঞ্জন রায় ১৯৯৩ : ২৪৫-৪৭]।

বাংলার দরবারী নাট্যে নারী কুশীলবের সর্বপ্রথম সন্ধান পাওয়া যায় ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। এ যুগের নৃপতি লক্ষণ সেনের সভাকবি ও *গীতগোবিন্দ*-এর রচয়িতা জয়দেবের স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত গায়িকা ও কথক নর্তকী পদ্মাবতী। মধ্যযুগের কামতা-কামরূপ রজ্যের সভাকবি রামস্বরস্বতীকৃত *জয়দেব* কাব্যের নিম্ন উদ্ধৃত অংশটুকু দেখা যাক :

> জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
> পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।
> কৃষ্ণর গীতক জয়দেব নিদগতি,
> রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।
> [বিনয় ঘোষ ১৯৫৭ : ১৪৪]

অর্থৎ, জয়দেব কৃষ্ণের স্তুতি গাইবেন এবং তার সম্মুখে পদ্মাবতী মুদ্রাসহকারে নৃত্য পরিবেশন করবেন; জয়দেব কৃষ্ণের গীত গাইছেন এবং পদ্মাবতী সেই গানের রাগ ও ছন্দ মিলিয়ে নাচছেন। বলা হয় জয়দেব এক কুশীলবদলের কণ্ঠশিল্পী ও তত্ত্বাবধায়ক এবং পদ্মাবতী সেই দলের একজন নারী কুশীলব ছিলেন [গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৮ : ৫৪]। উল্লেখিত নাটগীত অভিনয়-অনুষ্ঠান (performance) -এর সাথে 'ভরত নাট্যম' নৃত্যের সুস্পষ্ট মিল পাওয়া যায়– যেখানে (প্রধানতঃ) পুরুষ গায়কবৃন্দের সাথে সাথে নর্তকী মুকাভিনয় আঙ্গিকে অভিনয় করে চলেন। আর মিল পাওয়া যায় ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যে প্রস্তাবনা অংশের সাথে যেখানে সংগীত সহযোগে নটী নৃত্য করেন এবং সূত্রধরসহ নাট্যের মুখ্যাংশের অবতারণা করেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন , আদ্য রঙ্গাচার্য যেমন নির্দেশ করেছেন যে এই নাটগীত মধ্যযুগের সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

মুসলিম শাসনাধীন বাংলায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সংস্কৃত নাট্যচর্চা ব্যাহত হয় এবং এই ধারা মূলত নেপালী রাজদরবারসমূহে স্থানান্তরিত হয়। এর

মধ্যে ভাতখাঁও এর রাজদরবারে রচিত *মুদিতকুবলয়াশ্ব নাটক* (১৬২৮) এবং *হরগৌরীবিবাহ নাটক* (১৬২৯) দু'টো মৈথিলি ভাষায় হলেও প্রস্তাবনায় সংস্কৃত নাট্যের প্রভাবজাত সূত্রধর-নটীর সংলাপ ও নৃত্য লক্ষণীয়। সুকুমার সেন মনে করেন, "পূর্বভারত, বাংলা আসাম তীরহুতে, এই সময় নাটপালা এই রকমই ছিল" [সুকুমার সেন ১৯৬৫ : ৮৬]। এসকল উল্লেখ হতে সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করা যেতে পারে যে মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চল ব্যতিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা এবং তৎসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের দরবারী সংস্কৃত নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

চার

সংস্কৃত নাট্যচর্চা ব্যতিরেকে, সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে রচিত বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও নারী কুশীলবের উল্লেখ দেখা যায় :

> নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
> বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ।।

বীণাপা রচিত একটি গীতের উদ্ধৃত অংশে নৃত্য ও গীত সহযোগে একটি অভিনয়-অনুষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে যা আশ্চর্যজনকভাবেই রামস্বরস্বতীর অনুরূপ, কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া- অর্থাৎ এখানে এক নারী কণ্ঠের সাথে এক পুরুষ কুশীলব নৃত্যরত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও নারী কুশীলব সমৃদ্ধ নাটগীত ঐতিহ্যের কিছু উদাহরণ রয়েছে। সতের শতকের *গোপিচন্দ্রের গান-এ* (রচিয়তা অজ্ঞাত) হীরা নটী, একই শতকে রূপরাম চক্রবর্তী রচিত *ধর্মমঙ্গলে* সনকা, রামদাস আদক রচিত *ধর্মপুরানে* হীরাবতী, ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত *শ্রীধর্মমঙ্গলে* ইন্দ্রের রাজসভার নটী এবং ষোড়শ শতকে হলায়ূধ মিশ্র রচিত *সেখশুভোদয়ায়* নর্তকীর উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে এসকল নারী কুশীলব হয় তৎকালীন, নয় নিকটবর্তী অতীতের রাজসভায় প্রচলিত অভিনয়-অনুষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করে।

বলা বাহুল্য যে এসকল নারী কুশীলবের সামাজিক অবস্থান ছিল গণিকার সমপর্যায়ে। মধ্যযুগের বাংলায় রক্ষিতা পোষা ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। রাজরক্ষিতাগণ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণের সমক্ষে এবং অভিজাতবৃন্দের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতেন। দোনাগাজীকৃত সতের শতকের রচনা

সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল এর নিম্নোক্ত পংক্তিতে রাজরক্ষিতাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা রয়েছে :

বেশ্যা সব নৃত্য করে অতি সুললিত
রাজবেশ্যা নৃত্য করে অপরা বর্জিত।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ৩৩৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রাপথে সৈন্যদের মনোরঞ্জন করতেন রাজরক্ষিতাগণ, যেমন দেখা যায় ষোড়শ শতকে আব্দুল হাকিম রচিত *লালমতী সয়ফুলমুলক* হতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত পংক্তিতে :

চলিলেক সারি সারি
যত রাজ বেশ্যা নারী
নৃত্যগীত অতি মনোহর।
নানা বাদ্য বাজে ঘন
নাচ এ নর্তকীগন
সৈন্য চলে হরিষে অন্তর।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ৩৪৮]

রাজরক্ষিতা ছাড়া সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীগণও অভিনয়কলা চর্চা করতেন এবং পারিবরিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতেন। এমনটি দেখা যায় মুহম্মদ খান রচিত *সত্যকলি বিবাদ সংবাদ* (১৬৩৫) -এ :

কেহো নানা যন্ত্র বাহে কেহো গাহে গীত
কেহো হাসে খেলে কেহো নাচে আনন্দিত ।।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ১১০]

১৪২৫-৩২ এর ভেতর মা হুয়ান কৃত *Ying Yai Sheng -lan* গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে রাজকীয় ভোজসভায় পেশাদার নারী নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পীগণ জমকাল পোষাকে সজ্জিত হয়ে পুরুষ যন্ত্রীদের সাথে অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন।

এদের পরিবেশিত গীত ভাটিয়ালী, পাহাড়িয়া প্রভৃতি লোকসুরে গাওয়া হতো বলে মা হুয়ান বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এগুলো বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এর অনুরূপ, সেটিও উপরোক্ত সুরেই অভিষিক্ত। মা হুয়ান কিছু ভ্রামনিক দলেরও উল্লেখ করেছেন যারা নগর অভিজাতদের দুয়ারে দুয়ারে সানাই ও ঢোলকসহ গীতবাদ্য পরিবেশনা করতেন [মমতাজুর রহমান তরফদার ১৩৬৪ : ৩৯]।

উৎসবসমূহে সর্বসাধারণের মাঝে অনুষ্ঠিত নাটগীত জাতীয় অভিনয়-অনুষ্ঠানের কথা জানা যায় অপর চীনা পর্যটক সি ইয়াং চাও কুয়্যা তিয়েন লূ-এর (১৫২০ সালে সমাপ্ত) গ্রন্থ হতে। তিনি লিখেছেন, যখন তাঁরা তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন, তখন অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য সেখানে অভিনেত্রী ও নটী দ্বারা পরিবেশিত নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা করা হয় [Zulekha Haque ১৯৮০ : ৯৪]। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজাদের জন্য নাটগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায় পনের থেকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোহাম্মদ কবির কর্তৃক রচিত *মনোহর মধুমালতি* পুঁথিটিতে :

রাজ্যের যত লোক ছিল 'মঙ্গলা' শুনিয়া আইল
নাটগীত বাদ্যের কল্লোল।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ২০]

এতে আরও পাওয়া যায় অপরূপ সাজে সজ্জিতা নারী কুশীলবদের বর্ণনা যারা মৃদঙ্গ, ঢাঁক, কাড়া, মন্দিরা, শিঙ্গা, সানাই, দোতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে স্বর্গের অপ্সরীদের মত নৃত্য পরিবেশন করেন :

নর্তকীর দেখি সাজ মোহ যায় দেবরাজ
নাচে যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ২৬০]

১৬৫২-৫৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে মাগন ঠাকুর রচিত *চন্দ্রাবতী* হতে বিভিন্ন লোক উৎসবে নারী কুশীলবদের অংশগ্রহণের কথা জানা যায় :

নটী সবে নট করে প্রতি ঘরে ঘরে
গাইন সবে গীত করে চাতরে চাতরে

এইমত সপ্তদিন নিশিদিন ভরি
বাদ্যধ্বনি আছিল আনন্দ মনিপুরী
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ২৯৬]

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস *মলূয়া, কেনারাম, মনসার ভাসান* প্রভৃতির নারী কবি-কুশীলব চন্দ্রাবতীর নাম গর্বের সাথে স্মরণ করে। নীচে তাঁর অসমাপ্ত *রামায়ণ* থেকে উদ্ধৃত করা হলো :

ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে
চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে।
বাড়িতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী
তার ঘরে জন্ম নিল চন্দ্রা অভাগিনী।
. . . .
বিধিমত প্রণাম করি সকলের পায়
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।
[মোহাম্মদ সাইদুর ১৯৮৬ : ১৯-২০]

পাঁচ

মধ্যযুগের সাহিত্যে নারী কুশীলবের এসকল উল্লেখ যখন সুস্পষ্টভাবে তাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, ঠিক তখনই বিস্ময়করভাবে চৈতন্যের কৃষ্ণযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পুরুষ কুশীলব দ্বারা অভিনীত হতে দেখা যায়। *চৈতন্য ভাগবত* (১৫৪৮) এ বৃন্দাবন দাস এরূপ একটি অভিনয় অনুষ্ঠানের কথা উদ্ধৃত করেছেন যেখানে চৈতন্য স্বয়ং অভিনয় করেছেন রুক্মিনী চরিত্রে, সাথে কৃষ্ণ চরিত্রে ছিলেন অদ্বৈতাচার্য এবং বুড়ি বড়াই চরিত্রে নিত্যানন্দ। চন্দ্রশেখর আচার্যের আঙিনায় এ উদ্দেশ্যে একটি চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছিল। এমনও উল্লেখ পাওয়া যায় যে রূপসজ্জার স্থান ছিল পৃথক এবং পুরুষ কুশীলবের রূপসজ্জা এতটা নিঁখুত হয়েছিল যে উপস্থিত ভক্তকুল কুশীলববৃন্দের প্রকৃত পরিচয় সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। আরও জানা যায়, সতের শতকে কৃষ্ণশেখর দাস রচিত *হরিবিলাস* নামের অপর এক কৃষ্ণ যাত্রাপালা রচয়িতার এক শিষ্য রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। জুলেখা হক বলেন :

যদিও বর্তমানে বহু নামকরা নারী কীর্তনিয়া খ্যাতি লাভ করেছেন, তবু (মন্দির গাত্রে খোদাইকৃত অথবা স্থাপিত) ফলকে রূপায়িত কীর্তনের দৃশ্যে কেবল পুরুষ

গায়কদের দেখা যায়, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে (মধ্যযুগে) নামকীর্তন সমাবেশে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হতো না [Zulekha Haque ১৯৮০ : ৯৭]।

কেন বৈষ্ণবগণ তাঁদের সকল অভিনয় অনুষ্ঠানে থেকে নারীদের সরিয়ে রেখেছিলেন ? সম্ভাব্য কারণ এটাই হতে পারে যে চৈতন্যের নিকট মানুষও ঈশ্বরের সম্পর্ক ছিল রাধা-কৃষ্ণের সমতুল্য। অতএব কৃষ্ণ যাত্রায় কোন নারী কুশীলবের পরিবর্তে তিনি নিজেই রাধার ভূমিকায় কৃষ্ণের পার্থিব লীলায় অংশগ্রহণ করবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক। উপরন্তু তৎকালীন সমাজে নরী কুশীলব অর্থই ছিল পতিতার সমতুল্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *চৈতন্য ভাগবত* এর অন্ত্যলীলা খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হতে নারী কুশীলব, বিশেষতঃ দেবদাসীদের সম্পর্কে চৈতন্যের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চৈতন্য কর্তৃক পুরীতে অবস্থানকালে নীলাচল হিন্দু রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনাধীন ছিল এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসীগণ অভিনয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করতেন। *চৈতন্য চরিতামৃতে* বর্ণিত হয়েছে :

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে।।

গুর্জরীরাগে *গীতগোবিন্দের* পদ গাইছিলেন দেবদাসী। নারী বা পুরুষ আন্দাজ না করে আবিষ্ট অবস্থায় চৈতন্য ধেয়ে চললেন গায়িকার দিকে। তখন

স্ত্রী গায় বলি, গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে ।।
স্ত্রীনাম শুনি প্রভুর বাহ্য হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা।।
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ।।
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন ছার।।
প্রভু কহে তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা।।
. . . .
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে ।।

[কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৯৭৪ : ৫৭৬-৭৭]

"স্ত্রী স্পর্শে " যদি মরণ হয় তবে নাট্যাভিনয়কালে নারী কুশীলবসহ কৃষ্ণের লীলাভিনয় সম্ভব নয়। উপরন্তু মুসলিম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বৈরী মনোভাবের সম্মুখীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁদের ধর্মীয় সমাবেশে অভিনয় অনুষ্ঠানসমূহকে দেবদাসী অথবা নটীবৃন্দ পরিবেশিত অনুষ্ঠানের সমতুল্য করে দেখতে চায়নি। যদিও বেশ কিছু সংখ্যক পতিতা চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তবুও বৈষ্ণবদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশনায় 'নীতি বিবর্জিত' নারী কুশীলবের অংশগ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। চৈতন্য পরবর্তী সময়ের লোকনাট্যের অত্যন্ত অপ্রতুল উল্লেখসমূহকে একত্রিত করলে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও চৈতন্য উপাখ্যান ভিত্তি করে পরিবেশিত যাত্রা ক্রমশঃ বাংলার প্রধান নাট্যধারায় পরিণত হয়। যেহেতু চৈতন্য এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ অভিনয়কালে নারী ভূমিকায় রূপদান করেছেন, সেহেতু বাংলার লোকনাট্যের প্রতিটি শাখায় এই প্রভাব সম্প্রসারিত হয়।

ছয়

মধ্য অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পূরক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ দেশজ (লোক এবং সংস্কৃত) নাট্যধারাকে কোনঠাসা করে ফেলে যার ফলে ইউরোপীয় আদর্শ অনুসৃত *পিকচার ফ্রেম প্রসিনিয়াম থিয়েটার* বাংলার মূল স্রোতধারায় পরিণত হয়। কিন্তু প্রান্তিক সংস্কৃতির দুর্বল অবস্থান থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিছু কিছু নারী কুশীলব শহরে, বিশেষতঃ কলকাতায়, ঢপ কীর্ত্তন ও খেউড় পরিবেশনার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন। সুকুমার সেন বলেন:

> সম্ভ্রান্ত ধনীদের আসর জমত বাইনাচে, ধনী বৈষ্ণব সেখানে কীর্তনওয়ালীকে আনালেন। নতুন ঠাটে লেখা পদাবলী এই নারী কীর্তনীয়াদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই রীতির নাম হলো "ঢপ কীর্তন " অর্থ্যৎ বাইজীর হাবভাবের সাথে কীর্তনগান [সুকুমার সেন ১৩৭৭ : ৫৭-৫৮]।

পাবনার জোড় বাংলা মন্দিরের সর্বনিম্ন *ফ্রিজে* এধরনের সম্ভ্রান্ত ধনীদের একটি আসর তুলে ধরা হয়েছে। ফলকটিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এক সম্ভ্রান্ত পুরুষের সম্মুখে ছয়টি নৃত্যরতা নারী প্রতিকৃতি এবং চারটি বাদ্যবাদনরত পুরুষ প্রতিকৃতি রূপায়িত হয়েছে। সম্ভ্রান্ত পুরুষের পানপাত্রে অপর এক রমণীকে সম্ভবতঃ মদিরা পরিবশেনরত অবস্থায় দেখান হয়েছে [Zulekha Haque ১৯৮০ : ৯৫]।

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে নারী কবি-কুশীলব অক্ষয় বাইতিনী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। বলা হয়, একই শতকের কোনো এক সময় "রাজা বৈদ্যনাথের রক্ষিতা কোন বারবিলাসিনী" প্রথম মহিলা যাত্রা প্রচলন করেন [গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ১৯৭২ : ১৬৪]। আরও জানা যায় যে ইনি *বিদ্যাসুন্দর পালা* গান করতেন। এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে কলকাতা ও নবদ্বীপে 'বৌ মাস্টারের দল' এবং 'বৌকুণ্ডের দল' নামে দুটো পৃথক যাত্রাদলের অধিকারী ছিলেন মহিলা; একথা ছাড়া বিশেষ কিছু জানা যায় না [গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ১৯৭২ : ৩৫]।

ওদিকে ইউরোপীয় রীতি আশ্রিত নাট্যধারায় নারীকুশীলব কর্তৃক প্রথম মঞ্চে পদার্পণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য লাভ করা যায়। বিস্ময়ের কথা এই যে, পুনরায় সেই 'জনগণের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়' রোধের সংকল্পে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত কলকাতার ইংরেজি নাট্যশালায় (অর্থ্যাৎ 'ওল্ড প্লে-হাউস' ও 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এ) অভিনেত্রীর পদার্পণ নিষিদ্ধ ছিল- যদিও খোদ বিলেতে সপ্তদশ শতকের পঞ্চাশের দশকেই মঞ্চে অভিনেত্রীর আগমন ঘটেছিল। ১৭৯৫ সালে হেরাসিম লেবেদেফ *কাল্পনিক সংবদল* (জডরেল*কৃত The Disguise* নাটকটির রূপান্তর) পরিবেশনার ক্ষেত্রে এদেশীয় নারী ও পুরুষ কুশীলব সমন্বয়ে সমর্থ হন। এরপর নারী ও পুরুষ কুশীলব একত্রে অভিনয়ের সংবাদ মেলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত নবীনচন্দ্র বসু প্রযোজিত *বিদ্যাসুন্দর* নাটকে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত কিছু ব্যতিক্রম বাদে ঊনবিংশ শতকের 'শিক্ষিত' বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী নাট্যমঞ্চে নারীদের অভিনয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবেই সোচ্চার ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে চারজন অভিনেত্রী অন্তর্ভূক্ত করা হয় যাঁরা আদিতে ছিলেন বারাঙ্গনা। এর বিরুদ্ধে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবল প্রতিবাদে মুখর হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি তাঁর সকল ধরনের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। ঢাকায় স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা 'সর্বপ্রথম' নাট্যাভিনয়ের সংবাদ মেলে ১৮৮০ সালে। গুন্নুবাঈ, আন্নুবাঈ এবং নয়াবন -এই তিন বোন নিজেদেরে উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি মঞ্চে *ইন্দ্রসভা* নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং এতে অভিনয় করেন [মুনতাসির মামুন ১৯৮৫ : ৩৫]।

সাত

বর্তমানকালেও বাংলাদেশের লোকনাট্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অভিনয় করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ রাজশাহী অঞ্চলের 'আলকাপ', ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'ব্যইদ্যানির গান' বা 'মাইট্যা তামশা' ও 'ঘাটু গান' এবং

রংপুর অঞ্চলের 'ছোকরা নাচ' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসকল অভিনয়-অনুষ্ঠান (performance) এ পুরুষ কুশীলব অভিনয় ও নাচের পাশাপাশি গানও গেয়ে থাকেন। কুশীলবদের বয়স ১৪ বছরের কাছাকাছি, এরা শাড়ি ও লম্বা পরচুলা ব্যবহার করেন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বড় চুল রাখেন। ঘাটুগানে সাধারণত, চার থেকে পাঁচ জন ছেলে সমবেত গান ও বাজনার সাথে নেচে গেয়ে মুকাভিনয় ঢঙে চরিত্রাভিনয় করে চলে। গানগুলো মুলতঃ আদি রসাত্মক। যেমন :

সখিরে কৃষ্ণ আমার বাজায় বাঁশী ঐ কদম্ব বনেরে
ঐ কদম্ব ডালেরে-
কুলমান সব ছাড়বো আমি ঐনা বাঁশির সনেরে।

[আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৭৮ : ৮০]

যদিও এসকল অভিনয়-অনুষ্ঠান ধর্মীয় আচারের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তবু সাধারণভাবে এর মূল বিষয় হয়ে থাকে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান। ঘাটু দল গাইতে পারে এমন ছেলেকে দলে নেবার জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকে। এসকল ছেলেরা দলনেতা, যিনি সাধারণতঃ প্রাক্তন অভিনেতাও বটেন, তাঁর অধীনে তালিম নেয় এবং মাসিক মাসোহারা পায়। ঘাটু দলের ছেলেদের উপর [illegible] নিপীড়ন এবং সাধারণভাবে তাদের নিয়ে দলের বিবাদ ঘটে থাকে।

ঘাটু গানের মতো একই পরিবেশনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 'ছোকরা নাচ' ধর্মীয় আচার সম্পর্কিত নয় বরং আদিরসাত্মক আবেদনের জন্য খ্যাত। *ময়মনসিংহ গীতিকার* 'মহুয়া' উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত বাইদ্যানির গানে 'সং নাচ' অন্তর্ভুক্ত এবং নারী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রায় আশি বছর আগে পদ্মার পূর্বপারের বাংলায় বাইদ্যানির গান ছিলো ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সে সময় বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে মহুয়া উপাখ্যান ভিত্তি ক[illegible]খের অভিনয় পরিবেশনার যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, নিম্নে উদ্ধৃত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোকগীতি (ঘোষা গান) হতে সেটি অনুমান করা সম্ভব :

মামু হইল উমারা বাইদ্যা, ভাইগনা বাইদ্যানি
ভাতিজা উঠিয়া বলে চাচা আমি লবজানি।।

ইদানিং আলকাপ ও বাইদ্যানির গানে নারী কুশীলব অভিনয় করলেও তাঁরা যাত্রা অভিনেত্রীদের মতই সামাজিকভাবে নিগৃহীতা এবং নষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত।

লোকনাট্যের শাখাসমূহের মধ্যে অষ্টক, রয়ানি গান, রামায়ন গান, সং নাচ, পদ্ম পুরান, জারী ও ভাসানে নারী কুশীলবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এসকলের মধ্যে রয়ানি গান সম্ভবতঃ আদি হতেই নারী কুশীলব দ্বারা অভিনীত। রাধা-কৃষ্ণ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব উপাখ্যান কেন্দ্র করে পরিবেশিত অষ্টক মূলত ধর্মীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। অষ্টক দলে সাধারণত চারজন কিশোরী থাকে যারা পুরুষ গায়ক দলের সাথে মুকাভিনয়মূলক নৃত্য পরিবেশন করে। কিন্তু অষ্টক শুধু যে নারী কুশীলব দ্বারাই পরিবেশিত হয় তা নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পুরুষ কুশীলব দ্বারা গঠিত দল এবং পুরুষ ও নারীদের সম্মিলিত দলের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়। অপর পক্ষে রয়ানি গানে মূল গায়েনের ভূমিকা সাধারণত নারী কুশীলব পালন করেন। বেহুলা-লখিন্দর আখ্যান ভিত্তি করে সর্পদেবী মনসার উদ্দেশ্যে নিবেদনকৃত এসকল অভিনয় অনুষ্ঠান মূলত বরিশাল অঞ্চলেই দেখা যায়। এ অঞ্চলে সুচিত্রা সার্বাগ্য-এর নেতৃত্বে এমন একটি বিখ্যাত রয়ানি দল রয়েছে। রামায়ন গান সাধারণত পুরুষ কুশীলব দ্বারা গঠিত হলেও একটি ব্যতিক্রম হলো নেত্রকোনার বিভারানী দাস পরিচালিত দলটি। পদ্মপুরান দেবী মনসার উদ্দেশ্য পরিবেশিত হলেও কুষ্টিয়ার এমন একটি দলে কর্ণধার আহমেদ একজন মুসলমান এবং তাঁর দলে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন নারী কুশীলববৃন্দ। বেহুলা-লখিন্দর আখ্যান ভিত্তি করে পরিবেশিত অপর একটি অভিনয় অনুষ্ঠান ভাসান। খুলনার পাইকগাছার এমন একটি দলের অভিনেত্রী এক অন্ধ মহিলা। কারবালার কিংবদন্তী ভিত্তি করে পরিবেশিত এবং করুণ ও বীর রস সঞ্চারণক্ষম জারি সাধারণত পুরুষ কুশীলব দ্বারা অভিনীত ও গীত হয়। কিন্তু একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম হলো সাতক্ষীরা, খুলনা অঞ্চলের রুবিনা পরিচালিত দল। এতে তিনি নিজেই পুরুষ গাইয়ে ও বাজিয়েদের সঙ্গতে মূল গায়েনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন। পাঁচ শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য সম্বলিত সং নাচে লোকজ হাস্যরসের সুতীক্ষ্ণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। নেত্রকোনার গফুর মিঞার সং-এর দলে স্ত্রী চরিত্রে রূপদান করেন নারী কুশীলব। কবির লড়াই ও বিচার গানেও নারী কুশীলব অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের খুকুরানী শীল ও মানিক শীলের দলটি এমন এক উদাহরণ।

আট

সংকলিত ইতিহাসের প্রথম যুগ হতে মধ্যযুগের প্রারম্ভিক অধ্যায় পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ, বিশেষত বাংলার অভিনয়রীতির এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এমন একটি ঐতিহ্যের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ করে যেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের অংশীদরিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথমার্ধে (১৩ থেকে ১৬ শতক) একটি স্পষ্ট

পরিবর্তন ঘটায় এই প্রেক্ষাপট থেকে আপাতঃদৃষ্টিতে নারী কুশীলব অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্ধানের অন্তরালে তিনটি কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে :

১. মুসলিম শাসন,

২. বৈষ্ণব নাট্য-গীত চর্চা ও

৩. সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব বিচ্ছিন্ন নান্দনিক চাহিদা যা 'animus' ও 'anima' ধারনা স্বীকার করে।

মুসলিম শাসন এই অন্তর্ধনের জন্য সরাসরি দায়ী নয়। তেমনটি হলে মা হুয়ানের বর্ণনায় অথবা মধ্যযুগীয় রচনায় রাজসভায় বা জনসমক্ষে নারী কুশীলবের উল্লেখ পাওয়া যেত না। উপরন্তু আদ্য রঙ্গাচার্য স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাট্যচর্চার বিলুপ্তির পেছনে মুসলিম শাসন কোনোক্রমেই দায়ী নয়। এমনকি ক্ষীণ মুসলিম সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্বলিত দক্ষিণ ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যরীতি, "কথাকলি" ও "যক্ষগান" আদি হতেই শুধু মাত্র পুরুষ কুশীলব দ্বারা অভিনীতি [আদ্য রঙ্গাচার্য ১৯৭৫ : ১৩৬]

অপরপক্ষে বৈষ্ণব প্রভাবের কারণে নারীকুশলববৃন্দের সম্পূর্ণ অন্তর্ধান ঘটেয়েছিল এমনটাও নয়। যদি তাই হতো তবে লেবেদেফ ও নবীন চন্দ্র বসু নারী পুরুষ একত্রে অভিনয় করাতে অসমর্থ হতেন। তাঁরা যে নারী কুশীলবের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা থেকেই প্রমাণ হয় যে লিখিত ইতিহাসের আড়ালে নারী কুশীলবের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। অবশ্য লিখিত ইতিহাস যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নীরব তা নয়। ১৯ শতকের সংবাদপত্রে যাত্রা, কীর্তন ও ঝুমুর ইত্যাদি পরিবেশনায় পতিতাদের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে জানা যায়,

নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্যে অভিনয়কলার নান্দনিক প্রয়োজন অনুসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় কুশীলবের ক্ষেত্রে 'animus' ও 'anima' -এর প্রয়োগ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এমন একটি ধারা যা লিঙ্গবিভেদ অস্বীকার করে সেখানে হঠাৎ করেই কেন নারী কুশীলব নিষিদ্ধ হবেন ?

এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে প্রাক-মুসলিম সংস্কৃত দরবারী নাট্যের নারী কুশীলব ছিলেন প্রাসাদের অন্তঃপুরবাসীনি অথবা মন্দিরের দেবদাসীগণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিজয় সেন (১০৯৬ -১১৫৯) ও ভট্ট ভবদেব তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করেছিলেন বলে জানা যায় [নীহাররঞ্জন রায় ১৯৯৩; ৪২]। মুসলিম বিজয়-উত্তর কালে স্বভাবতই এসকল মন্দিরের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং আর্থিক কারণে দেবদাসী পোষণ দুষ্কর হয়ে পড়ে। মুসলিশ দরবারে বিনোদন

হিসেবে নৃত্যাভিনয় গুরুত্ব লাভ করলেও অমুসলিম আখ্যানসমূহ পরিত্যক্ত অথবা রূপান্তরিত হয়: কথক নৃত্য এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সুনিপুণা দেবদাসীদের অভাবে রাজপ্রাসাদ এবং মন্দিরভিত্তিক নাট্যাভিনয় প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌছায়। এভাবেই ১৬ শতকের ভেতরে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরভিত্তিক নাট্যাভিনয় হতে নারী কুশীলব প্রায় অন্তর্হিত হলেন।

কিন্তু জনগণের পৃষ্ঠাপোষকতা সমৃদ্ধ লোকনাট্যের ইতিহাস কিছুটা ভিন্নতর। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৬শতকে বৈষ্ণববাদ প্রসারের সাথে সাথে কৃষ্ণ যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি বৈষ্ণব নাট্যগীতচর্চা বাংলার প্রধান সাংস্কৃতিক ধারায় পরিণত হয় এবং বিভিন্ন কারণে বৈষ্ণবগণ নারী কুশীলব বিবর্জিত অভিনয় রীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু তাই বলে নারী কুশীলবদের উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ধারণা করলে ভুল হবে। লোকনাট্যের মূখ্যধারা যাত্রায় তাঁদের উপস্থিতি লক্ষ্য না করা গেলেও প্রান্তিক সাংস্কৃতিক বলয়ের গৌণ নাট্যরীতিসমুহে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজকীয় নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে তাঁরা তাঁদের উপস্থিতি বজায় রেখেছিলেন ঠিকই। যেহেতু "ভদ্রজন" কর্তৃক লোকসংস্কৃতির প্রান্তিক বলয়ের ইতিহাস সচরাচর নির্মিত হয় না, সেহেতু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁদের অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে চিরতরে। তথাপি পতিতা এবং অচ্ছুৎরূপে নারী কুশীলবগণ টিকে রইলেন। ভদ্রজন সমক্ষে তাঁদের ক্বচিৎ আবিভার্বের স্বাক্ষর মেলে লেবেদেফ ও নবীন চন্দ্রের নাট্য প্রযোজনায়।

মধ্যযুগের বাংলার নারীদের সমাজিক মর্যাদা সম্পর্কিত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক কারণ রয়েছে যা উপরোক্ত কারণসমূহের সাথে পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছিল। পণ্ডিতবর্গ সাধারণত ধারণা করে থাকেন সে সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি অধিকতর মাতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাক-বৈদিক যুগে কৃষিজাত অর্থনীতি যখন ভ্রুণাবস্থায় বিরাজমান তখনও মাতৃ অধিকার ছিল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর্য সংস্কৃতির ইতিহাস এই মাতৃ অধিকার প্রবলভাবে দমন পূর্বক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের ইতিহাস। আর্যগণ কর্তৃক অনার্য (দ্রবিড় এবং অন্যান্য "দস্যু -দাস") জাতিসমূহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করানোর ফলে দৈহিক শ্রম সুলভ হয়ে পড়ে। এর পরিণতিস্বরূপ নারীগণ তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদনশীল বিবেচিত হন এবং একই সাথে তাদের সামাজিক অবস্থান ক্রমশ নিম্নমুখী হতে থাকে। পিতৃতন্ত্র কর্তৃক নারীদের তাদের পূর্ব মর্যাদাবান অবস্থান হতে অপসারণের প্রক্রিয়া আরম্ভের সাথে সাথে, অনেকটা প্রাথমিক ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মর্তৃদেবীরূপে নারীকে দেবতুল্য করে তোলা হয়। কিন্তু পিতৃতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলে

সে ব্যবস্থাটুকুও অবলুপ্ত হয়ে যায়। শুধুমাত্র বাংলার মত আর্য সংস্কৃতির প্রভাববলয়ের প্রান্তিক অঞ্চলসমূহে মুসলিম বিজয় পূর্ব যুগ পর্যন্ত মাতৃ-অধিকার তুলনামূলকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ।[৫]

মধ্যযুগের ব্রক্ষ্মণ্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতিরেকে অধিকাংশ সাহিত্যকর্মে, যেমন মঙ্গল কাব্য ও *ময়মনসিংহ গীতিকায়,* স্পষ্টভাবে বলিষ্ঠ নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সর্পদেবী মনসা ও শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর এর বিবাদের পরিণতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষোক্ত পূর্বোক্ত-এর উপাসনায় বাধ্য হয়। অপর এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বেহুলা, যে তাঁর মৃত স্বামীর গলিত লাশসহ ভেলায় চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে দ্বিধা করেনা এবং দেবতার দরবারে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের মনতুষ্টি অর্জন করে স্বামী ও দেবরদের জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। অপরদিকে *ময়মনসিংহ গীতকায়* ধর্মের উর্ধে যে উদার মানবতাবাদের বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে, তার গভীরেও নারী বিস্ময়করভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মহুয়া এমনই এক নারী চরিত্র যে তাঁর প্রেমের জন্য সাহস ও একাগ্রতার বলে সকল পুরুষ চরিত্রকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে গেছে। অপর দিকে নাথ গীতিকায় ডাকিনী (বৌদ্ধ সিদ্ধানারী) ময়নামতির সাক্ষাত মেলে, যে তাঁর সাধনাবলে অসীম জ্ঞান ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু জয় করে এবং জনগণের চেতনায় দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনসা, চণ্ডী, শীতলা ইত্যাদি মাতৃদেবীর এমন বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে কেবল পূর্বাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যেই পাওয়া গেলেও পূর্বাঞ্চলেই এঁদের অধিকতর ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা। মাতৃদেবীর উল্লেখিত ধারা একটি অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিহ্ন বহন করে যাকে গুপ্ত যুগ হতে শুরু করে প্রায় হাজার বছরের আর্য সভ্যতার প্রলেপ দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হয়েছিল। তাই গীতিকা ও মঙ্গলকাব্যের উদাহরণসমূহে নারীদের বিশেষ অবস্থান ও দেবীত্বে রূপায়ন এমন এক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নির্দেশ করে যেখানে পিতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃঅধিকার সম্পূর্ণরূপে জয়ী হতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব অভিনয়কলার ক্ষেত্রেও নারীদের উপস্থিতি সংক্রান্ত অনুমান ভুল হবেনা। কিন্তু ১৩ শতকে মুসলিম ও ১৬ শতকে বৈষ্ণব - পরপর এই দুই পিতৃতান্ত্রিক আঘাতের পর মাতৃতান্ত্রিকতার ভিত ক্রমশ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। ফলে ১৬ শতকের শেষ নাগাদ বাংলায় একটি প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তন ধরা পড়ে : পিতৃতান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট অগ্রগতি। পরিণতিতে পুরুষ আধিপত্য ক্রমশ প্রবল হয় এবং নারীদের স্থায়ীভাবে অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিতে জনসমক্ষে নারী কুশীলবকৃত সকল প্রকার পরিবেশনা 'কাম প্রবৃত্তিমূলক' *লেবেল* দ্বারা চিহ্নিত হয়। উপরন্তু নারীকুশীলবকৃত পরিবেশনাসমূহ পুরুষতন্ত্রে বিভেদ ও উচ্ছৃঙ্খলা সৃজনে

সক্ষম হেতু এসকল পরিবেশনা পুরুষ আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধাস্বরূপ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেচিত হয়। ফলে, জনসমক্ষে নারী কুশীলবকৃত সকল প্রকার পবিবেশনাকে হয় দমন, নয় কালিমা লেপন করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাবান অভিজাত সংস্কৃতির মূলস্রোতধারা নিচ্ছিদ্র নয়; অতএব মাতৃতান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান অবশিষ্টাংশে অভিজাত মহলের অলক্ষে চলতে থাকে। একই সাথে মনসা এবং মাতৃতান্ত্রিক আচার ব্যবস্থার অন্যান্য প্রতিভূ টিকে রইলো, রয়নি ও ভাসান এর ন্যায়, প্রান্তিক সাংস্কৃতিক ধারায়।

নয়

উল্লেখিত জরিপ ও যুক্তির আলোকে নিম্নোক্ত অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

১। বাংলায় নারী কুশীলব সকল যুগেই অভিনয় করেছেন; কখনও সাংস্কৃতিক মূলধারায়, কখনও বা প্রান্তিক উপধারায়।

২। বাংলা, তথা সমগ্র ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যে কুশীলবের লিঙ্গ ও চরিত্রের লিঙ্গ এই দুইয়ে বিভেদ স্বীকৃত হয়নি। সে কারণে মুসলিম বিজয়পূর্বে বাংলায় নারী ও পুরুষ কুশীলব উভয়েই নারী ও পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছে।

৩। কিন্তু নারী কুশীলবের সামাজিক অবস্থান বিচারপূর্বক প্রতীয়মান হয় যে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় তাদের ব্যবহার করা হয়েছে ভোগ্য পণ্য হিসেবে।

৪। অতএব, যদিও বারবাকৃত মন্তব্য সত্য যে নারী ও পুরুষ কুশীলব নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্র রূপদানে সক্ষম, তবুও একথাও সত্য যে পুরুষ শাসিত সামাজিক ব্যবস্থায় নারী কুশীলরের উপস্থিতি অথবা অন্তর্ধান পুরুষের চাহিদা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

পরিশেষে এ কথাটিও স্মর্তব্য যে সকল যুগেই নাট্য কুশীলবগণ সমাজের একটি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই কুশীলব সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান সকল যুগেই প্রান্তিক এবং তাঁদের কমবেশী অচ্ছূৎ রূপেই গণ্য করা হয়েছে। তাঁদের অস্তিত্ব সকলক্ষেত্রেই প্রথাগত ব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ। পুরুষ শাসিত সমাজে নারী কুশীলবগণ দ্বিগুণ হুমকীর কারণ : তাঁরা পুরুষের অহম মুহূর্তেই ধ্বংস করতে সক্ষম। একারণেই, জনগণের নৈতিক অবক্ষয়ের ধুয়ো তুলে তাঁদের মঞ্চ হতে দূরে রাখার চেষ্টা চলে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের দ্বারা, অথবা তাঁদের সুচিন্তিতভাবে কোনঠাসা করে ফেলা হয় বৈষ্ণব ও মুসলমানদের দ্বারা। কিন্তু আমরা তো জানি বেড়ালের নয়টি জীবন আসলেই তো কোনো অলীক কল্পনা নয় !

টীকা

১। প্রথম চার্লসের শিরোচ্ছেদ থেকে (১৬৪৯) রাজতন্ত্র পুনর্বহালের (১৬৬০) সংক্ষিপ্ত কাল।

২। জাপানের এই নটিনীরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের নর্তকী। ওকুনি ছিলেন ইয়ুমু অঞ্চলের কিমুকি বৌদ্ধমন্দিরের সেবিকা।

৩। 'কথা-নাট্য' ও 'নাট-গীত' ঐতিহ্যের বিস্তারিত আলোচনার জন্য মদীয় "নাটক ও নাট্যকলা", *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০২-১৯৭১ (সম্পাদনা সিরাজুল ইসলাম; ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ, ৪৪৪-৪৫ দেখুন।

৪। "..... নৃত্য ক্রিয়াদি দ্বারা যা করা যায় তাই নাট্য"। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত অর্থে নৃত্য গীত ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলিত রূপ বোঝাত। 'নৃত্যং, গীতং বাদ্যং চেতিত্রয়া সঙ্গীত মুচ্যতে' *সঙ্গীত রত্নাকর*-এ এই ব্যাখ্যা আছে।" গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের নৃত্যকলা* পৃ. ৫২।

৫। বিস্তারিত আলোচনার জন্য এম সি পি শ্রীভাস্তব কৃত *Mother Goddess in Indian Art, Archacology and Literature* পৃ. ১-১০ দেখুন।

গ্রন্থপঞ্জি

আদ্য রঙ্গাচার্য
১৯৭৫ *ভারতীয় থিয়েটার*। দিল্লী : বুক ট্রাস্ট।

আশরাফ সিদ্দিকী
১৯৭৮ *লোকায়ত বাংলা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আহমদ শরীফ
১৯৭৭ *মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। ঢাকা : মুক্তধারা।

কৌটিল্য [অনুঃ রাধাগোবিন্দ বসাক]
১৯৬৩ *অর্থশাস্ত্র*। কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ [সম্ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার]
১৯৭৪ *চৈতন্য ভগবত*। কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটির।

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়
১৯৭৮ *ভারতের নৃত্যকলা*। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
১৯৭২ *লোকনাট্য সমীক্ষা*। কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
নীহাররঞ্জন রায়
১৯৯৩ *বাঙালীর ইতিহাস,* আদি পর্ব। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং।

বিনয় ঘোষ
১৯৫৭ *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*। কলকাতা : পুস্তক প্রকাশ।

মমতাজুর রহমান তরফদার
১৩৬৪ "চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* ভাদ্র-অগ্রাহায়ণ ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন
১৯৮৫ *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার*। ঢাকা : সুবর্ণ।

মোহাম্মদু সাইদুর
১৯৮৬ "বাংলা আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী", *কর্মরত কারুশিল্পী*। ঢাকা : বাংলাদেশের জাতীয় কারুশিল্পী পরিষদ।

সিরাজুল ইসলাম (সম্)
১৯৯৩ *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি।

সুকুমার সেন
১৯৬৫ *নট নাট্য নাটক*। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ।
১৩৭৭ বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ। কলকাতা : রূপা এ্যান্ড কো.।
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্]
১৯৮০ *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। কলকাতা : নবপত্র।

সৈয়দ আলী আহসান
১৯৮৪ *চর্যাগীতিকা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

BARBA, Eugenio and SAVARESE,. Nicola
1991 *A Dictionary of Theatre Anthropology.: The Secret Art of the Performer.* London: Routledge.

INDU Shekar
1977 *Sanskrit Drama: Its Origia and Decline.* New Delhi: Munshiram Manoharlal.

BHARAT Pande M. L.
1979 *Traditions of Indian Theatre.* New Delhi: Abhinava Prakashan.

RUSTOM Bharucha
1990 *Theatre and the World.* New Delhi: Monohar.

Zulekha Haque
1980 *Terracotta Decorations of Late Medieval Bengal.* Dhaka: Asiatic Society.

Tarlekar, G, H
1975 *Studies in the Natya Shastra.* New Delhi: Motilal Besarsidass.

Bharata -muni (ed. Manamohan Ghosh)
1967 *Natya Shastra.* Calcutta: Manisha.

Shrivastava, M. C. P
1979 *Mother Goddess in Indian Art Archaeology and Literature.* Delhi: Agam Kala Prakashan.